আলোচনা

সর্বশক্তিমান অন্ধকার, ভালোবাসার আকর্ষ : দেবদাস আচার্যের কবিতা

গীতা চট্টোপাধ্যায়

> তুই বাড়ি যা ঐ রাখালদের সঙ্গে, আমি আসছি'— এই বলে তিনি (বাবা) একটা বড় মোষের পিঠের ওপর আমাকে চাপিয়ে দিলেন। ... আমি মোষের পিঠে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। ... কিছুক্ষণ পরে দেখি, যে মোষটার পিঠে চড়েছি, সেটা দলছুট হয়ে কোন পথ দিয়ে যচ্ছে কে জানে, ... বিশাল বিজন অন্ধকার মাঠে মোষটা একা একা চলেছে— আমি তার পিঠে শুয়ে অর্ধচেতন।
>
> —'দেবদাস আচার্যর জীবন প্রভাত',
> পরমা : মণীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত,গ্রীষ্ম-বর্ষা ১৩৮৫ সংখ্যা)

নির্জনতা বিশালতা আর ভয়ানক সৌন্দর্যের মাঝখানে একটা মোষের পিঠে চড়ে চলে যাওয়া, বিশাল নির্জন অন্ধকার মাঠে মোষটা একা একা চলেছে— আমি তার পিঠে শুয়ে অর্ধচেতন।

যমের সুবিদিত বাহন মহিষ। তারই পিঠে চড়ে ভয়ানক সৌন্দর্যের মধ্যে চলা। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বলা হয়েছে : 'আমরা কোন পথে যাইব, তাহা যমই প্রথম দেখাইয়া দেন। সেই পথ আর বিনষ্ট হইবে না।' (১৪ সূক্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত)। অবিনশ্বর পথেই পৃথিবীর ভীষণ সুন্দরতার প্রতি বিহিত থেকে মৃত্যুতাড়িত যাযাবর জীবনের উদাসীনতার দিকে যাত্রা। এই কি কবি দেবদাস আচার্যের উদয়াস্ত কাহিনি?

২

যাযাবর জীবনের শুরু শৈশবেই যেদিন হঠাৎ পাকিস্তানের নিশান উড়ে গেল ভদ্রাসন বাটি গাঁয়ে, দেশত্যাগ করলেন কবি রাতের অন্ধকারে :

> রাত নিষুতি আমরা আমাদের প্রিয় বাড়িটি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমার নিজ হাতে লাগানো নারকেল, আম, লিচুর গাছগুলো এখানেই থাকল। ... ঢেঁকিশালের পাশে একটা চালাঘরের ভিতর দেওয়া হচ্ছিল— শুনেছিলাম সেটা আমার ঘর হবে— ঐ ঘরে আমার আর কোনোদিনই থাকা হবে না।
>
> —তত্রৈব

ভাসমান পরিকল্পনাহীন জীবনের সূত্রপাত। রাণাঘাট থেকে বীরনগর, সেখান থেকে রাধানগর, কৃষ্ণনগর। নৈহাটি। এই নৈহাটি স্টেশনেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো। দেশলাইয়ের খোলে, সিগারেটের প্যাকেটে নিজের নাম লিখে ট্রেনে ছুঁড়ে ফেলা। তারা অনেক দূরে চলে যাবে ট্রেনের সঙ্গে। 'তুচ্ছ অস্তিত্বকে প্রসারিত করে সুখ'।

নৈহাটিতে জেগে উঠছিল এক বিষাদময় উদাসীনতা। সমবয়সীরা স্কুলের ছাত্র, সর্বক্ষণের বন্ধু কোথায় মিলবে! 'গঙ্গার ঘাটে সন্ধেবেলা অনেকক্ষণ একা বসে বসে জেগে উঠত শোকবিহ্বলতা।' তমসাতীরে শ্লোকের জন্ম হয়েছিল শোক থেকেই তো।

ওঁ বাঙ্— শক্তি, মূর্ত হও, প্রত্যাঘাত করো, ফাটাও শূন্যতা,
এই পাপ, এই তামস, এই হিম অন্ধকার ছেঁড়ো,
ক্ষেপণ করো মহামন্ত্র
ভাঙো ও নির্মাণ করো।

—মৃৎশকট ১৬

৩

'ফাটাও শূন্যতা।'

কবি দেবদাস আচার্যের পৃথিবীর কাছে প্রার্থনামন্ত্রই ছিল : জিহ্বা দাও, মূর্তি দাও, শূন্যতা হরণ করে আত্মা দাও, কামবীজ দাও' (উৎসবীজ)। এক কথায় সংরক্ত জীবন দাও, মানবিক শিল্প দাও। একে তিনি বলতে ভালোবাসেন 'পরিশ্রম' : 'ঘুম ও জীবনের মধ্যে রয়েছে এক পরিশ্রম' ('আমার কালক্রম ও প্রতিধ্বনি')। গীতায় কৃষ্ণ বলেছিলেন; 'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন' (গীতা ৪।৫)। আমাদের বহু জন্ম ছিল, বহু জন্মান্তর, তুমি ভুলে গেছ, আমি ভুলিনি অর্জুন!— এই বহু জন্ম বহু রূপান্তর, তাই-ই 'আমার কালক্রম'। 'ঘুম'? মৃত্যু। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে যে জীবনযাপন, তারই শ্রমফল শিল্প। সে জিহ্বা দেয়, অর্থাৎ ভাষা। মূর্তি দেয়, অর্থাৎ বিমূর্ত অবচেতনকে অবয়ব। শূন্যতা হরণ করে দেয় আত্মা। নিরর্থক অস্তিত্বকে দেয় অর্থময়তা। কিন্তু 'কামবীজ'? সব শিল্প সৃষ্টির উৎসবীজ। প্রবল প্রবৃত্তি। একে কি তুমি 'রিপু' বলবে? কবি বলবেন : 'সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুক নই/মানুষের অহংকার নিয়ে পদস্খলন নিয়ে/বেঁচে থাকতে চাই'। (ঠুঁটো জগন্নাথ)

আশ্চর্য নয়, এই কবির কলমে— দরদে ঢালাই ঢোকরাশিল্প হয়ে উঠবে 'মানুষের মূর্তি' : তাঁর দেশবিভাগের পরবর্তী জীবনের এক একটি বলিষ্ঠ ভাস্কর্য। বাবার সেলাইকল, কাপড়ের গাঁট মাথায় নিয়ে আসা, মায়ের গৃহস্থালি, ভাই বোনদের একটু একটু বেড়ে ওঠা। জোরালো জীবন বিশ্বাসেই একপাশে স্থান করে নেবেন এমনকি এক 'থুত্থুড়ে মাজা বেঁকে যাওয়া বৃদ্ধা... দিদিমার পিসিমা... বদ্যিবুড়ি, কালীনদী, ধুলোর পথে কণ্টিকারী বড়ির কৌটো' আর মুখে সেই আশ্চর্য ঘোষণা : 'আমি ধন্বন্তরি বুড়ি, ঐ লোকালয়কে বাঁচাতে চলেছি'। ছিন্নমূল জীবনে 'চিরায়ত' তাঁর বাবার জীবন-সংগ্রামের আত্মপ্রত্যয়ও : 'যেন একটা বটচারা গজিয়েছে তাঁর চোখে/আর তিনি ঝরিয়ে দিতে চাইছেন/বিশাল ছায়া, মৃদু বাতাস' ('বটগাছ', মানুষের মূর্তি)। তারই কাছে পিঠে মায়ের নিভৃত চিন্তা : 'তুই জানিস খোকা হাটে ছায়া আছে তো?'

('অনুভব', তত্রৈব)। মাটির অপর নাম তাই তাঁর কাছে 'মাধ্যাকর্ষণ', স্নেহের অনিবার্যটান : 'হে প্রিয়তম মাধ্যাকর্ষণ/আমার স্ত্রী পুত্র ও বন্ধুদের জন্যে প্রার্থনা করি/ : তুমি তাদের মাটির সঙ্গে আটকে রেখো'। ('মায়া', ঠুঁটো জগন্নাথ)। আমন্থর শস্যভারাতুর ধরিত্রীর মতো 'তৃপ্তি'র প্রতিমূর্তি পান তিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনীতে :

গর্ভবতী এই স্ত্রীলোকটি আমার স্ত্রী
চমৎকার দিনগুলি এসেছে আমি বুঝতে পারি
সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে আমি প্রবেশ করতে পারি

অল্প নত মুখ, প্রতিমুহূর্তের নির্বাণ-নির্যাস ঝরছে তার তন্তু থেকে
ধ্যানী আর নম্র, একটু গম্ভীর আর সুখী
আমার জানুতে হাত রেখে লম্বা হাই তুলছে, আর
সমস্ত মৌলিক পৃথিবী গুটিয়ে আসছে তার শরীরের ভিতর

আমার চারপাশে অফুরন্ত রোদ আর হাওয়া বইছে
আমি দ্বিগুণ মানুষ হয়ে উঠছি দিনদিন

—ঠুঁটো জগন্নাথ

'সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুক নই'। মানুষ। 'দ্বিগুণ' মানুষ।

৪

'শিল্পের বিষয় জিনিসটা কী?' প্রশ্নটা তুলেছেন দেবদাস আচার্য তাঁর 'ব্যক্তিগত কৌতূহলবশতঃ' নিবন্ধে (দ্রষ্টব্য : অজ্ঞাতবাস সংকলন, ১৯ মে ১৯৮৫)। প্রসঙ্গত Ernst Fischer-এর The Necessity of Art থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এই বলে, 'Content' হল আসলে 'theme' বা মর্মবস্তু। তাঁর বক্তব্যে : 'বিষয় জিনিসটা কালের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ... কাল বা যুগ... একরকম কাল-চেতনা স্রোত।' স্বভাবতই কালের বিরুদ্ধে সংঘাতও তার অন্তর্গত হয়ে যেতে বাধ্য। তাঁর দৃষ্টিতে : 'Blake থেকে শুরু করে যে কোনো বড় মাপের কবিকেই ঐ Wrestling-এ অংশগ্রহণ করতে হয়েছে।' (তত্রৈব)

দেবদাস আচার্যের কবিতায় এই কালচেতনা সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধবর্তী পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সংকট তখন ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের জীবনকেও জড়িয়ে নিচ্ছিল একই ঘূর্ণাবর্তে। সেই সঙ্গে ছিল ভারতবর্ষের, তথা একান্ত নিজস্ব বাঙালি জীবনের সমস্যা। দেবদাস লিখছেন : '১৯৪৩ থেকে ১৯৫৩ দশটি বছর বাঙ্‌লার বুকে, বাঙালির জীবনে একটা টাইফুন বইছে' ('সকালের আলো-ছায়া', গল্পসরণি)। দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, রাজনৈতিক হাতবদল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ছিন্নমূল মানুষের ঢল। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত নথিবদ্ধ এবং অনথিবদ্ধ মিলিয়ে ষাট লক্ষ থেকে সত্তর লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু এদেশে চলে আসে। ১৯৫৭-৫৮

থেকেই তীব্র খাদ্য সংকট। আন্দোলন একের পর এক। সবচেয়ে বেশি চালের সমস্যা, কয়লার সমস্যা। কবির কঠিন স্মৃতিচারণ : 'পাঁচ মাইল দূর থেকে আধমণ কয়লা বহন করে আনতে হত আমাকেই। মাথায় করে।' তাঁর চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে সে-ছিল এক অসহায় দুঃস্বপ্ন!

কিন্তু বিষয়বস্তু হিসেবে কী উঠে আসছে তাঁর কবিতায়? সে তো ব্যক্তিগত এই অলাভ, এই ক্ষতি নয়, একটা বৃহৎ মহৎ কালপরিণাম : 'রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এই মহাবিপর্যয়ের একটা সুফলও ... জাতবিচার, ছোঁয়াছুঁয়ি, অচ্ছ্যুৎ এ সব যা আমি দেশের বাড়িতেও দেখেছি, এখানে যেন তা রাতারাতি উবে গেছে। এর বাড়ির ভাত আর ওর বাড়ির তরকারি একাকার হয়ে গেছে এতদিনে।' (তত্রৈব)। ফলত জাতহারানো একটা একাকার মানুষের মূর্তি ক্রমশ উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়। ছুতোরকাকা, গহরের বাপজান, মিস্ত্রী দাদু। একই সুখদুঃখের শরিক। 'খরা, বন্যা, জোতদার আর মহাজন/আমরা জীবনভোর ঝড়ো হাওয়া আর খিদের সঙ্গে লড়েছি'। (মানুষের মূর্তি)।

বিষয়ের প্রশ্নে একদিন বলেছিলেন : 'মানুষ কোন inspired voice কবিদের কাছ থেকে আশা করেন?' যা ছিল ab-extra, out of human nature, সেই morality-র পরিবর্তে ab-intra, within human nature-এর নতুন morality. মানুষ সমন্ধে এই নতুন নৈতিক মাপকাঠি তাঁর 'সুভাষিতম্' ১লা মে ১৯৯৭ সংকলনে স্থান পেয়েছে : 'সীমাবদ্ধতার মধ্যে... সম্পূর্ণ বিকাশ বা সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সম্ভব নয়।' একদিন শৈশবে খালি দেশলাইয়ের খোলে নাম লিখে ট্রেনের কামরায় ছুঁড়ে দিতেন। সেই থেকে আরম্ভ আত্মসম্প্রসারণের কাজ। আজ পরিণত প্রজ্ঞায় : 'কোনো আত্মাই ব্যক্তিগত নয়/একক পরিচর্যায়/ তাকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব নয়।' অপূর্ণ অস্তিত্ব বা অশুদ্ধ অস্তিত্ববোধ বা সারাৎসারহীন অহং, তাকেই ক্রমশ সম্প্রসারণের পথে চালিত করা :

> কোন প্রজাপতিটি আত্মার কোনটি আত্মার নয়
> কোন আকাশ আমার প্রিয় কোনটি অন্যের
> কোন নদী আমার মর্মগাথা বহন করে কোন নদীটি অন্য কারো
> কোন স্বপ্ন আমি রচনা করেছি কোনটি আর একজন
> এভাবে
> কোনো কিছু ভাগই করা সম্ভব নয়
>
> —সুভাষিতম্

তারই নাম তো 'একটিই সমগ্রতা' যাতে 'সমস্ত রূপ ও আঙ্গিক/একীভূত হয়ে/আহুতি রচনা করে একদিন।' অথবা সেই আলো, যা শুষে নেয় 'সর্বশক্তিমান অন্ধকার' এবং 'ভালোবাসার আকর্ষ ছড়িয়ে দেয়।' মৃত্যুর ওপরে জয়ী হয় জীবন। 'অনশ্বর এই চির-ছেদহীন আলো'। ('আচার্যের ভদ্রাসন')।

৫

ক্রমাগত খুলে যাওয়া দরজা। একটির থেকে অন্যটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কালচেতনায় প্রসৃত এই কবি অনুভব করেন : 'পৃথিবীর সব সময়ই ক্রান্তিকাল'। পাঁচের দশক থেকে সাতের দশক। 'আমি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠি সমসাময়িকতায়'। ('আমার কালক্রম ও প্রতিধ্বনি')। কিন্তু প্রতিবিধান নয় প্রতিক্রিয়া। যথা সাতের দশকের শিল্পীর সেই নিষ্ফল ভূমিকা : 'পরাজিত প্রতিনায়কের/পায়ের শিকল-টানা শব্দে রাজপথে হাঁকে ট্র্যাজিক বিউগল'। ('এই এক দুঃসময়', কালক্রম ও প্রতিধ্বনি)।

দেশের আত্মা যখন চিতার ওপরে, যুবশক্তি দহমান, তখন দক্ষিণা তো দিতে হয়, 'হে ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে'? মূল্য ধরে দিচ্ছেন শিল্পী তাঁর বিবেক : 'আমার দক্ষিণা শুধু আমার বিশ্বাস, এক সগর্ব সাহস'। এক জ্বলন্ত দশকের শিলমোহরে মুদ্রিত হয়ে যায় তাঁর কবিতা। তখন সময়ের থুতনি ছুঁয়ে বেড়ে উঠেছে রক্তাক্ত ভোরবেলা'। বন্দী-শিবিরের থার্ড ডিগ্রির ফলশ্রুতি। 'পিছনে ফেউয়ের মতো স্নায়ুযুদ্ধ ও হল্লাগাড়ি'। নাৎসি বাহিনীর আদলে। কয়েদি পালাচ্ছে সংকেত দিয়ে, লাশ পাহাড় : 'মধ্যরাত থেকে তীব্র পাগলা-ঘন্টি এবং অনির্দেশ সাইরেন/এখন ছ্যাকড়া গাড়িতে করে মানুষের ভবিষ্যৎ পুরানো চুক্তি-পত্র'। এখন বাজার নয় 'বাজার গরম', মিথ্যা প্রচারের রমরমা। 'মানবিকতা পরাজিত হলে বুদ্ধিজীবীদের মদের গেলাস ভরে/উঠছে উল্লাসে'। এরই মধ্যে স্বপ্ন : 'একটি সমবেত প্রভাতফেরী'।

এই মুহূর্তে শিল্প? 'আমি জানি ভাঙা ও গড়ার মধ্যে শিল্পকেও সাজাতে হবে বর্মে'। কেমন 'বর্ম? 'গামবুট পায়ে বিপ্লবী গেরিলা'। ('ঝড় : সত্তর দশক', কালক্রম ও প্রতিধ্বনি)। স্মরণীয়, Walter Pater পার্সোনালিটির অপর নাম দিয়েছিলেন 'স্টাইল'। স্টাইলকে দেবদাস আচার্যও মনে করেন : 'সংসারের নানা বস্তুগত ও ভাবগত সংঘাতে গড়ে ওঠা এক গভীর personality— যার মধ্যে সমসাময়িকতা ছুঁয়ে এক বহমানতা থাকে'। ('ব্যক্তিগত কৌতূহলবশতঃ')। দেবদাস আচার্যের ক্ষেত্রেও তাঁর ফর্মই তাঁর স্টাইল। 'প্রতিটি মুহূর্ত এক অদ্বিতীয় মুহূর্তের জন্ম দিচ্ছে'। (উৎসবীজ)।

৬

বোঝা যায়, এ যুগের 'অন্ধ কবি' কেন নিজেকে 'অন্ধ ঋষি' বলেছেন : 'এই মধ্যবিত্ত শহরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গুহার আড়াল থেকে দৈববাণী উচ্চারণ করি'। (মৃৎশকট ২০)।

কোন দৈববাণী? সমস্ত বিদ্রোহ, শ্রমের পরেও থেকে যায় গান বা ডাহুকের রহস্য-আহ্বান : 'পুনরায় জেগে ওঠে সপ্তর্ষিমণ্ডল, দূর নক্ষত্রের ঝাঁক/ওড়ে ভৈরবীর উদ্ধি অপ্সরীর গর্ভকেশর/স্নায়ুর ওপর...' (তত্রৈব ২৫)। শুধু সমসাময়িকতা নয়, তাঁর কবিতা তাই পেয়ে গেছে সৃষ্টির আদিধাতু : 'এই নাও নাভির রক্ত-পদ্ম ও কামপোকা মেলে ধরো তোমার রহস্যশিখা'। (তত্রৈব ১৮)।

শুধু মানচিত্রে বন্দী যে-মানুষ, সে মরণাপন্ন অসহায়। কেননা রাষ্ট্রিক সীমানা-বদলের যন্ত্রণায় সে খর্ব। কিন্তু যখন সে ইতিহাসের অঙ্গীভূত, তখন বৃহৎ কালখণ্ডে পরিসরমান : 'মানুষ যখন ভূগোলে থাকে, তখন সে মূহ্যমান, স্বয়ংক্রিয়, যখন ভূগোলের/বাইরে যায়, তখন সে নিরেট/আমাদের ধমনীতে নৌকো বেয়ে যায় ইতিহাস, আমাদের স্বপ্নের তাঁত বুনে চলে কাল'। (তত্রৈব ২৮)।

এখানেই সবরকম তাত্ত্বিক কবিতার বাইরে চলে যায় তাঁর ভাষাশিল্প। তাঁর শিল্প তাঁর কাছে : 'আমার সামান্য অহংকারের পুচ্ছ'। তাতে একান্তভাবেই 'ব্যক্তিগত কল্পনাময় পরিবেশ' এবং 'স্থাপন শরীরের লবণ আর করোটির ঘিলু', 'স্নায়ুকোষ অনন্তপরিধি'। কল্পনামনীষা মেধাবৃত্তি আর শরীরী সংবেদনের যোগফলে তা কালবিস্তারী। শরীরের লবণ, শ্রমচেষ্টা। কিন্তু সবরকম প্রয়াসের পরেও তিনি শিল্পে উৎসারণবাদী : 'শিল্পের সময় জন্মের সময় কিছুতেই অপেক্ষা করে না'। প্রতিসরণকারী দুই মানবিক চোখ দিয়ে শিল্পী হেলন করে নেন স্বাভাবিক চলমানতায় জীবনের স্বাদ। তিনি থাকেন প্রতিটি ঝর্ণার মধ্যে নুড়ির মতো বিশ্ব ব্যাপারে। তবু 'বিচ্যুত হতে চাই না ইতর ঘটনাবলীর মধ্যে। তাঁর ক্রমজায়মানতা এক অস্তিত্বের থেকে আর এক অস্তিত্বের মধ্যে, এক ধ্বনি থেকে আর এক ধ্বনিতরঙ্গে স্মরণাতীত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে চোলাই হয়ে, জারিত হয়ে'। কী চান তিনি? 'নক্ষত্রের জল? পৃথিবীর পাঁউরুটি?' পরাবাস্তব অথবা বাস্তব? দুইয়ের সমন্বয়? মৃৎপিণ্ড পৃথিবীই ক্রমশ উড্ডীন গতিমুখরিত শকট। মৃৎশকট।

> দুঃখ নয়, শোক নয়, ভালোবাসা নয়
> সে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল সময়ের মাঝখানে, হাতে পেটানো ঘণ্টা
> ঠিক সময়মতো সে একটি করে শব্দ তোলে, শীতল আড়াল থেকে, ...
> একটি বিরাট তারা লাটিমের মতো তার মাথায় ঘোরে

সেই কেবল জানে, মানুষের চামড়া দিয়ে গড়া এই পৃথিবীর পিঠ পুড়ে যায় 'তারা'? একটি নতুন জীবনবিশ্বাস;

> ... একটি নতুন যুগও জীবনপ্রণালী আকাশের উজ্জ্বল তারার মতো
> ভেসে আসে
> সাড়ে চারশো কোটি বৎসরের জীবাশ্ম এই পৃথিবী,
> জীবাশ্ম এই পৃথিবী, ওঁ, জীবাশ্ম এই পৃথিবী।
>
> —মৃৎশকট ৮০

৭

এই যে পৃথিবীসূক্ত, যা গদ্যলিরিক, তাকে কী বলা যাবে কবিতা? কবির নিজের স্বগতোক্তিতে 'গদ্যের আকারে যে টুকরো কবিতাগুলো লেখা হচ্ছে ওগুলোও কি লিরিক? ... হ্যাঁ, তা হতেই পারে— যদি তার মধ্যেও মন্ময় সুরের ধ্বনিটি থাকে।' হোরেসের আশ্বাসবাণী মনে রেখে বলা যায়, সাহস করে যে কোনো বিষয় অবলম্বন করা চলে, যদি শক্তি থাকে, শব্দের অভাব হবে না। শিল্প সম্বন্ধে এই তাঁর শেষ দায়বদ্ধতা, ঠিক সময় মতো একটি

করে শব্দ তোলা শীতল আড়াল থেকে : 'ও ছাড়া দায়বদ্ধতাই বলুন, আর commitment-ই বলুন, আর কিছু আমি বুঝি না।' ('তাৎপর্যহীন গদ্য')। বস্তুত তাঁর শেষ দায়বদ্ধতা তাঁর নিজস্ব আদর্শবাদে : 'একজন মানুষকে আমি হাঁটিয়ে দিই আর সামনে/সে হাঁটতে হাঁটতে ফুরিয়ে যায়, তখন আবার/একজন মানুষকে তার খোঁজে পাঠাই'। (ঠুঁটো জগন্নাথ)।

৮

স্বভাবতই পৃথিবীর বাসিন্দা হয়েও মহাজাগতিক বিশ্বের জাতক এই কবি : 'আমার খানিকটা নিয়ে আছি/আর সবই আকাশের'। ('মানুষের মূর্তি')। সাড়ে চারশো কোটি বৎসরের জীবাশ্ম মাত্র নয় এই পৃথিবী, তার আগে বসেছে 'ওঁ'। প্রণব মন্ত্র। আত্মবাচী। আসলে পৃথিবীর এক বিশিষ্ট অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী : 'পৃথিবীর বিশুদ্ধ একটা আত্মা রয়েছে' ('আত্মা', ঠুঁটো জগন্নাথ)। তার কাচের শরীর ধ্বনির শরীর। সেখানে মানুষের জন্মও সূক্ষ্ম কলায় : 'আমি সূক্ষ্ম অতি জাগতিক/চেতনার ধারা-স্রোত থেকে/ছিটকে আসা পরমাণু এক/রূপহীন, মায়া-কায়াহীন/মৌল অণু, পৃথিবীতে এসে/তার রসায়নে মিশে গেছি।/তার নিজ চেতনার স্রোতে/বীজে ও আঙ্গিকে অন্তর্লীন। (উৎসবীজ)।

'রসায়নে মিশে গেছি'। রসায়ন কী? সেই রসায়ন, 'সহস্র-ধারা উজ্জীবন অনুপ্রেরণায়'। মহাকাশ অগ্নিময় বস্তুর জঙ্গল, ব্ল্যাকহোল গ্রাস করে নেয় অতীত, সব স্মৃতি। নক্ষত্রের জিভ ভয়ংকর শব্দ চেটে খায় প্রাণবায়ু, ওঙ্কারধ্বনি। তারই মধ্যে পৃথিবী প্রাণময় স্নেহার্দ্র সজল। মানুষের হৃদয় : 'মহাকাশে ভাসমান একটি উজ্জ্বল অশ্রু'। কবির পূর্বভূমি জনতা : 'তোমরা আমাকে গড়ে তুলেছ ইতিহাসের উত্থানের মন্ত্র দিয়ে'। পটভূমি স্বদেশ : 'প্রতিটি অঙ্গে চামড়ায়... ভারতীয় জনপদের ছবি'। জীবনপ্রার্থনা : 'ভালোবাসার উষ্ণ বাতাসের মধ্যে থেকে/একদিন ফুটে উঠবে আমার বীজ ও বিবেক'। 'বীজ'? 'মায়ার অধিক কিছু প্রেম'। আর 'বিবেক'? সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট : সাক্ষী, 'আমি রাজা বিক্রমাদিত্য জাগ্রত থাকি চেতনার মধ্যে'। তিনি বসেন বত্রিশ সিংহাসনে। স্থির মূল্যবোধে।

৯

আর এক রূপে তিনিই তো সিদ্ধাচার্য, খড়িয়া নদীর কূলে তাঁর বাড়ি, ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী, 'তাঁর তৃতীয় নয়ন অশ্রুতে ভেসে যায়'। (আচার্যর ভদ্রাসন)। 'ডোম' তিনি : 'আত্মশরণ... মধুপান করেন।' কী তাঁর পরিচয়? 'আত্মার বিনাশপ্রার্থী শূদ্র সিদ্ধাচার্যদেব। ত্রিতাপ দুঃখে কাতর/সরকারি কেরানি/সান্ধ্যস্নান সেরে ফেরেন নীল সরস্বতী নদী থেকে/তিল তণ্ডুলে জাউ। একঘটি জল/মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় মন্ত্রীর কপটার/...হে মহাজাতক/মুক্ত করো রিপু/শূন্যে বাজে গম্ভীর শাঁখ। ('সায়াহ্নিক,' আচার্যর ভদ্রাসন)। নীল সরস্বতী নদী থেকে স্নান করে ফেরেন। শ্মশান নদী। মৃত্যু দুঃখ পুনর্জন্মের প্রার্থনা। 'একটি অবয়বে/জীবনের সমাপ্তি হয় না।' (তর্পণ, 'জীবন')। মৃত্যু তাঁর কাছে 'সর্বভুক অমরত্ব' : 'ঝরে পড়ে সূর্যমুখীর পাপড়ি, কিন্তু তার বীজের জাগরণ/আবার আমাকে ভাবিয়ে

তুলেছে।' (ঠুঁটো জগন্নাথ)। বোধের অতীত এক মেধা গড়ে তোলে অখণ্ড জীবনপ্রবাহের ধারণা : 'নদী ডাকে, চলো দয়াময়,/আমার সঙ্গে চলো, মোহময়।' ('আহ্বান', তর্পণ)।

১০

নদীপারের দিগন্ত তাঁর শব্দশিল্প : 'আমার রক্তের বিদ্যা দিগন্তরেখার বাঁকে বিভূতি ছড়ায়' (উৎসবীজ)। শব্দও কখনো 'আলো ধু-ধু আলো/নিবিড়, প্রগাঢ় অন্ধকার, শব্দ', কখনো 'নিচু হালকা মেঘের চাপ চাপ শব্দ'। (মানুষের মূর্তি)। কবিতায় শব্দ কেমন হবে? তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতায় : 'ধ্যানই ইন্দ্রজাল। গভীর মন্ময়তাই ইন্দ্রজাল। এবং তখন ঐ অবস্থায় আহরণ করা একটা তুচ্ছ শব্দও ইন্দ্রজাল-শক্তি অর্জন করে। একটা উচ্চতা পেয়ে যায়।' (ব্যক্তিগত কৌতূহলবশত)।

ম্যাজিক, সংকেত, উচ্চতা, যেন গ্রহান্তরে মানুষ সাংকেতিক ভাষায় লিপি পাঠাচ্ছে মহাপ্রাণের সন্ধানে : 'একটি প্রদীপশিখা ভেসে যায় ছায়াপথে/... আমি দূর থেকে দেখি সেই শিখার কম্পন/খোঁজে নিরবধিকাল আপনার অনুরূপ একটি পৃথিবী।' (উৎসবীজ)। যেন গেরস্ত সংসারের আপাত নিরীহতার আড়ালেই চাপা বিস্ফোরণ : 'এই আগ্নেয়গিরি, সবাই ভাবে মৃত/চারিদিকে পাহাড়ি ঝোপঝাড়, দু-একটি ছাগল চরে ফিরে বেড়ায়/মৃত মৃত মৃত/একদিন কি প্রতিবাদ হবে না এর?' (নিউরোনগুচ্ছ)। কীটে ও আকরে, জলেস্থলে বন-ভূমিময়ে, শীৎকারে শ্মশানে শব্দ সেই মৌল অণু যার সঙ্গে মিশে কবি 'মায়াবী রিপুর টানে জরায়ুর নীল জলে করেছি তর্পণ'। ধরতে চেয়েছেন তিনি ভাষায় পৃথিবীর ঘূর্ণনের বিচ্ছুরিত ছটা রূপময় জৈব বিভা। আবার বাপ যার লুমপেন ফেরেব্বাজ, মা অন্য পুরুষের হাত ধরে ফেলে রেখে যায় এমন ভিখিরি বালকের হা হা চিৎকার। জরথ্রস্তের মতো তিনিও বলতে পারেন : 'জনপদের মিশ্র ধ্বনিময় এক গান থেকে উঠে আসছি আমি।' (অগ্রন্থিত কবিতা)।